? Tito
Signature Not Verified
Digitally signed by Tito
DN: cn=Tito, o=Muktadhara, c=AU
Date: 2004.12.22 08:38:37 + 10'00'

বঙ্গবন্ধু হত্যার প্রথম প্রতিবাদ

সিরাজ উদ্‌দীন আহমেদ

১৫ আগস্ট ১৯৭৫। সকালে জাতির জনক ও তাঁর পরিবারের হত্যার খবর শুনে বরগুনা জেলার জনগণ প্রকাশ্যে প্রতিবাদ করেছে। অন্যান্য জেলার জনগণ নীরবে কেঁদেছে। বরগুনার বীর জনতা সেদিন আমার আহ্বানে বঙ্গবন্ধু হত্যায় গভীর শোক প্রকাশ করে এবং সামরিক আইন ও কার্ফু ভঙ্গ করে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে।

সামরিক সরকারের অভিযোগ ছিল :

ইর্তণর্ দণ যরমবলফর্থর্টধমভ মতু্টর্রধটফ ীটষ মভ ১৫.০৮.৭৫ দণরণ ষট্র যরটর্ডধডটফফহ ভম ডলরতণষ র্ট ঈটরথলভট.্ভ ১৬.০৮.৭৫ র্ট টঠমর্ল ১৯০০ দমলট্র ট বর্ণর্ধভথ ষট্র দণফঢ র্ট দণ রণ্রধঢণভডণ মত ওঊৃ. কদণ তমফফমষধভথ ঐর্মশ. মততধডধটফ্র টভঢ ঈইওিঈী ফণটঢণট্র র্টণভঢণঢ দণ বর্ণর্ধভথ ষদণরণধর্ভ দণহ ণসযরণ্রণঢ্লরযরধ্রণ টভঢ ঢণণয ডমভডণরভ র্ট দণ পধফফধভথ মত ওদণধপদু্লনধঠলর ীটদবটভ টভঢ র্মদণর রণফর্টধশণ্র. কদণ যণট্রমভ্র র্টণভঢণর্ট দণ বর্ণর্ধভথ ষণরণু্র. ওধরটনলঢঢধভ ইদবণঢ ওঊৃ ঈটরথলভট...

আমি ১৯৭৫ সালে বরগুনার মহকুমা প্রশাসক। আমরা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দ্বিতীয় বিপ্লবের কর্মসূচী বাস্তবায়নে নিয়োজিত। সে সময়ে ১৫ আগস্ট সকাল ৭.৩০ মিনিটে বেতারে হঠাৎ ডালিম ঘোষণা করল– 'বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হয়েছে।' সামরিক আইন ও কার্ফু জারি করা হলো। আমি এককভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলাম– এ হত্যাকাণ্ড ও সংবিধান লঙ্ঘনের প্রতিরোধ করবই। আমি জানতাম অবৈধ সরকারের বিরোধিতা করলে মৃত্যু অনিবার্য– তাই অঙ্গীকার করলাম 'কদধ্র র্ধ দণ ণভঢ মত বহ ফধতণ.' বঙ্গবন্ধু হত্যার প্রতিবাদ ও খুনী সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করলে মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও আমি বরগুনার বাকশাল নেতাকর্মী ও ছাত্রলীগ এবং বঙ্গবন্ধুর অনুগত সরকারী কর্মকর্তাদের নিয়ে প্রতিরোধ শুরু করি। আমি প্রথমে ঘোষণা করলাম– আমরা খুনী সরকারকে স্বীকার করি না। বরগুনার রক্ষীবাহিনী নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ি। খুনী সরকারের পক্ষে সকল প্রকার মিছিল ও সমাবেশ নিষিদ্ধ ঘোষণা করি। জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা হয়। তিন দিন বরগুনায় সকল দফতরের কাজ বন্ধ থাকে। আমার বাসভবনে জনতার ঢল নেমে আসে। ১৫ ও ১৬ আগস্ট আমার সরকারী বাসভবনে বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের হত্যার প্রতিবাদে শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়। আমি পটুয়াখালী জেলা সদরে অবস্থিত রক্ষীবাহিনী লিডারের সঙ্গে যোগাযোগ করি এবং তাদের অস্ত্র নিয়ে প্রতিরোধ করার নির্দেশ প্রদান করি। রক্ষীবাহিনী ঢাকায় যোগাযোগ করে আমাকে জানায় যে, হেড অফিস থেকে তাদের কোন নির্দেশ দিতে পারছে না।

বঙ্গবন্ধু হত্যার প্রতিবাদে বরগুনায় যাঁরা আমার সঙ্গে ছিলেন তাঁদের মধ্যে বরগুনা জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি ও ফুলঝুড়ি ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আওয়ামী লীগ নেতা প্রয়াত সিদ্দিকুর রহমান (১৯৭৯ সালে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন), তৎকালীন বরগুনা জেলা ছাত্রলীগ সভাপতি জাহাঙ্গীর কবীর, ছাত্রলীগ সম্পাদক আব্দুর রশীদ, ছাত্রলীগ সহসভাপতি সুলতান আহমেদ, ধীরেন্দ্র দেবনাথ শম্ভু (সাবেক উপমন্ত্রী), দেলওয়ার হোসেন (বর্তমান এমপি), আবদুল মোতালেব ও আরও অনেকে। বাকশাল নেতাদের মধ্যে ছিলেন– এ্যাডভোকেট নুরুল ইসলাম সিকদার, এ্যাডভোকেট নিজামউদ্দিন আহমেদ এমপি, ইউনুস শরীফ, বরগুনা কলেজের অধ্যক্ষ শামসুল আলম, আব্দুল লতিফ ফরাজী, আব্দুল মান্নান প্রমুখ। সরকারী কর্মকর্তাদের মধ্যে ছিলেন– বরগুনা মহকুমা পুলিশ কর্মকর্তা ফররুক আহমেদ, জনসংযোগ কর্মকর্তা মাহমুদুর রহমান, সাব-রেজিস্ট্রার আলী আসগর, সার্কেল অফিসার (উন্নয়ন) মোখলেসুর রহমান, মহকুমা ত্রাণ কর্মকর্তা বিপ্লব কুমার শর্মা প্রমুখ।

আমার জীবনে প্রথম অস্ত্র তুলে নিয়েছিলাম ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট। আমার জীপে ছাত্রলীগ ও বাকশালের কয়েকজন কর্মী ছিল, তাদের হাতে ছিল অস্ত্র। সেদিন বরগুনার পুলিশের ভূমিকা সন্তোষজনক ছিল না। তাই আমি তাদের থানা থেকে বের হতে নিষেধ করি। আমার নির্দেশে বরগুনা শহরে রক্ষীবাহিনী টহল দেয়। ১৫ আগস্ট বরগুনায় ঘোষণা

দিয়েছিলাম যে, যারা খুনী সরকারের পক্ষে মিছিল বের করবে তাদের গুলি করে হত্যা করে বরগুনার খাকদন নদীতে ফেলে দেয়া হবে। বরগুনা শহর বা কোন থানায় মিছিল বের হয়নি। আমি ঢাকার সঙ্গে যোগাযোগ করে হতাশ হলাম। আমার বিশ্বাস ছিল অবশ্যই সামরিক সরকারের বিরুদ্ধে পাল্টা ক্যু হবে, কিন্তু তা হয়নি।

বরগুনায় আমাদের প্রতিরোধ চলে তিন দিন পর্যন্ত। আমাদের সঙ্গে স্থানীয় সংসদ সদস্য আসমত আলী সিকদার, নিজামউদ্দিন আহমেদ, শাহজাদা আব্দুল মালেক খান যোগ দেন। শাহজাদা আব্দুল মালেক খান খন্দকার মোশতাক আহমেদের আপন ভায়রা। তাঁকে খন্দকার মোশতাক তার মন্ত্রিসভায় নিতে চেয়েছিল। কিন্তু মালেক খান তা প্রত্যাখ্যান করেন। এমন চরিত্রের লোক বাংলাদেশে বিরল।

বরগুনায় আমাদের প্রতিরোধ ভেঙ্গে পড়ে। অবৈধ সরকার আমাকে চাকরিচ্যুত করে। পটুয়াখালীর অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক সরকারের আদেশ নিয়ে আমার স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে। সরকারী বাসভবন ছেড়ে দিতে হলো। পটুয়াখালী জেলায় আমার প্রবেশ নিষিদ্ধ হলো। আমি এ আদেশে ভীত হয়নি। অবৈধ সরকারের নির্দেশ আমাকে আরও সাহসী করেছিল। খবর আসছে আমাকে যে কোন সময় সরকার গ্রেফতার করতে পারে। যশোর সেনানিবাস থেকে খবর আসছে তারা নাকি আমাকে মেরে ফেলবে। ইতোমধ্যে বরগুনার বাকশাল কর্মীদের গ্রেফতার শুরু হয়। বরগুনা ও পটুয়াখালী পুলিশ আমার বিরুদ্ধে রিপোর্ট দিচ্ছে। আমাদের গোপন সভা চলছে। খালেদ মোশাররফ ক্যু করে খন্দকার মোশতাককে ক্ষমতাচ্যুত করলে আমরা সংগঠিত হই। ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে চার নেতা হত্যার প্রতিবাদে আমরা বরগুনা শহরে আওয়ামী লীগ নেতা প্রয়াত বাবু জ্ঞানরঞ্জন ঘোষের বাসায় গোপন সভার আয়োজন করি। সভায় বরগুনার আওয়ামী লীগ সেক্রেটারি এ্যাডভোকেট নূরুল ইসলাম সিকদার, ন্যাপের সেক্রেটারি এ্যাডভোকেট জয়নাল আবেদীন এবং বরগুনা কলেজের অধ্যক্ষ শামসুল আলম উপস্থিত ছিলেন। আমরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলাম ৬ নবেম্বর বরগুনায় জেলহত্যার প্রতিবাদে হরতাল পালিত হবে। রাতে বাকশাল ও ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরা প্রচার চালায়। ৬ নবেম্বর জেলহত্যার প্রতিবাদে বরগুনায় পূর্ণ হরতাল পালিত হয়। বাংলাদেশে ঢাকার পরে শুধু বরগুনা শহর ছাড়া আর অন্য কোথাও হরতাল পালিত হয়নি। ৭ নবেম্বর ঢাকায় খালেদ মোশাররফের বিপর্যয়ের পরে আমি বরগুনা ত্যাগ করে পটুয়াখালী হয়ে বরিশাল যাই। বরগুনার বাকশাল নেতা সিদ্দিকুর রহমান, ইউনুস শরীফ, এ্যাডভোকেট নূরুল ইসলাম সিকদার, নূরুল ইসলাম পাশা, আব্দুল মান্নান (বেতাগী); ছাত্রনেতাদের মধ্যে জাহাঙ্গীর কবীর, ধীরেন্দ্র দেবনাথ শম্ভু, আব্দুর রশীদ, মোতালেব প্রমুখ গ্রেফতার হন।

পরে ঢাকায় আমরা সামরিক সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ার চেষ্টা করি। ইস্কাটন গার্ডেনে সংসদ সদস্য নিজামউদ্দিনের মামা আলহাজ জয়নুল আবেদীনের বাসায় ১৯৭৬ সালের জানুয়ারি মাসে এক সভায় সিদ্ধান্ত হয়, চট্টগ্রামের এমপি নূরুল আলম, আমতলীর এমপি নিজামউদ্দিন আহমেদ ভারত গমন করবেন এবং সেখানে যশোরের এমপি রওশন আলীর সঙ্গে একত্রিত হয়ে সামরিক সরকার উৎখাতের কার্যক্রম গ্রহণ করবেন। তিনি সংসদ সদস্যদের কলকাতায় যেতে বলেছেন। তাই আমরা প্রায় ৪০ জন সংসদ সদস্যের সঙ্গে আলোচনা করি। দ্বিতীয়বার বরিশালের মহিউদ্দিন আহমেদসহ কয়েক সংসদ সদস্য ও আমার ভারতে যাবার কথা ছিল। কিন্তু যশোরে নিজামউদ্দিন ও নুরুল আলম গ্রেফতার হওয়ায় আমাদের পরিকল্পনা প্রত্যাহার করা হয়। যশোরে গোয়েন্দা বিভাগে আমার ভায়রা আব্দুস সাত্তার চাকরি করতেন। গ্রেফতারকৃত এমপিদ্বয়কে যেন সেনাবাহিনীর নিকট হস্তান্তর করা না হয় সেজন্য আমার স্ত্রী অধ্যাপিকা বেগম ফিরোজা যশোর গমন করেন। পরিশেষে নিজামউদ্দিন ও নুরুল আলমকে যশোর জেলে দীর্ঘদিন আটক রাখা হয়। পরে তাঁদের ঢাকায় স্থানান্তর করা হয়। নিজামউদ্দিন ও বরগুনার নেতৃবৃন্দ প্রায় ২ বছর পরে জেল থেকে মুক্তি পান। আমার বাসায় অনুষ্ঠিত শোকসভায় যারা উপস্থিত ছিল তাদের গ্রেফতার করা হয়। কিন্তু আমাকে শেষ পর্যন্ত গ্রেফতার করা থেকে সরকার বিরত থাকে। হয়ত আমি বিসিএস প্রশাসনের কর্মকর্তা হওয়ায় আমাকে তারা গ্রেফতার করেনি।

সেদিন যাঁরা আমার সঙ্গে বঙ্গবন্ধু হত্যার প্রতিবাদ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে অনেকে মৃত্যুবরণ করেছেন। যুবনেতা সিদ্দিকুর রহমান ১৯৭৯ সালে বরগুনা থেকে আওয়ামী লীগের এমপি নির্বাচিত হন। ১৯৮৬ সালের এরশাদের কারচুপির নির্বাচনে তিনি হেরে যান। ঢাকায় ১৯৮৬ সালের ২৯ জুন তিনি হঠাৎ মৃত্যুবরণ করেন। সিদ্দিকুর রহমানের মতো সাহসী বাংলাদেশে কম ছিল। আর এক প্রতিবাদী কণ্ঠ নিজামউদ্দিন আহমেদ ১৯৮৬ সালে আমতলী থেকে এমপি নির্বাচিত হয়ে এরশাদের স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে বরগুনা ও ঢাকার নেতৃত্ব দেন। ১৯৯০ সালের ৯ ডিসেম্বর গণঅভ্যুত্থানের বিজয় উৎসব পালনকালে ঢাকার ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনের সামনে সড়ক দুর্ঘটনায় নির্মমভাবে তিনি নিহত হন। সেদিন সকালে আমার সঙ্গে তার শেষ কথা হয়। মৃত্যুবরণ করেছেন বরগুনার যুব কণ্ঠস্বর এ্যাডভোকেট সুলতানউদ্দিন। ১৯৭৫ সালের প্রতিবাদী ছাত্রনেতা ধীরেন্দ্র দেবনাথ শম্ভু ১৯৯১ ও ১৯৯৬ সালে বরগুনা থেকে এমপি নির্বাচিত হন। আমি তাঁদের জন্য গর্বিত।

আমি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি বরগুনার সেদিনের ৭ লাখ জনতাকে। তারা সেদিন আমার আহ্বানে বঙ্গবন্ধু হত্যার প্রতিবাদ করেছে। আমার বিরুদ্ধে সামরিক সরকার একাধিক মামলা দায়ের করে। বরগুনার একজন লোকও আমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয়নি। পুলিশ বার বার প্রমাণ করার চেষ্টা করেছিল যে, আমি ১৫ আগস্ট প্রকাশ্যে রিভলবার দিয়ে জনগণকে ভয় দেখিয়েছি কি-না। আমার বিরুদ্ধে মামলা প্রমাণ করতে না পারায় সরকার আমাকে ক্ষমা চাইতে বলেছিল। আমি সংস্থাপন মন্ত্রণালয়কে বলেছিলাম, 'আমি বঙ্গবন্ধু হত্যার প্রতিবাদ করে গর্বিত, আমি ক্ষমা চাইতে পারি না।'

আমি ১৯৭৫ সালের পূর্বে লেখক ছিলাম না। ১৫ আগস্টে জাতির জনকের নির্মম হত্যার প্রতিবাদে আমি লেখক হতে বাধ্য হয়েছি। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট অস্ত্র দিয়ে বঙ্গবন্ধু হত্যার প্রতিশোধ নিতে পারিনি। তাই প্রতিবাদ জানাতে কলম ধরেছি। ছাত্রজীবনে বঙ্গবন্ধুকে বার বার দেখেছি। তাঁর ভাষণ শুনেছি। তিনি ১৯৬৯, ১৯৭০ ও ১৯৭৩ সালে বরগুনায় এসেছেন। এ সময় তাঁর সংস্পর্শে এসেছি। বরগুনার এমপি আসমত আলী সিকদারকে তিনি খুব ভালবাসতেন। শেখ ফজলুল হক খান, আসমত আলী সিকদার, সওগাতুল আলম সগীর, ফ্লাইট সার্জেন্ট মুহাম্মদ ফজলুল হক বরিশাল বিএম কলেজে আমরা সতীর্থ ছিলাম। বিএম কলেজ থেকে আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হই। এমএসসি পড়ার সময় ফজলুল হক বিমানবাহিনীতে যোগ দেন। ১৯৬২ সালে শেখ মণি, আসমত, সগীর ও আমি এমএ পাস করি। ১৯৬২ সালে সামরিক আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলনে আমরা সামনের কাতারে ছিলাম। ১৯৬৪ সালে কনভোকেশনে গবর্নর মোনায়েম খানের বিরুদ্ধে আন্দোলনকালে আমরা একই সঙ্গে ছিলাম। শেখ মণি ও আসমত আলীর এমএ ডিগ্রী মোনায়েম খান কেড়ে নেয়। আজ শেখ মণি নেই। তাঁকে এবং তাঁর স্ত্রীকে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট হত্যা করা হয়। সওগাতুল আলম সগীরকে ১৯৭৩ সালের ১ জানুয়ারি আততায়ীরা হত্যা করে। আগরতলা মামলায় অভিযুক্ত এবং সাবেক সংসদ সদস্য ফ্লাইট সার্জেন্ট ফজলুল হক ১৯৯৫ সালের ১৫ জানুয়ারি মৃত্যুবরণ করেন। আসমত আলী সিকদারও আজ আমাদের মাঝে নেই। আমি তাঁদের স্মৃতি বহন করছি।

লেখক সাবেক এসডিও, বরগুনা

শিকওয়া ও জওয়াবে শিকওয়া